the ULABian

A STUDENT MOUTHPIECE

Contains exclusive Bangla and English content...

জুন ২০১৩

ক্যাম্পাস ধূমপানের অবাধ ক্ষেত্র নয়

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

ধূমপানের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা থাকাটা কতটুকু যৌক্তিক? কেউ কেউ মনে করেন ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান করে দেয়ার মানে ধূমপানকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা; আবার অনেকের মতে নির্দিষ্ট স্থানে ধূমপান করতে দেয়া হলে তা ধূমপানের সংস্কৃতিকে সরাসরি উৎসাহিত করার সামিল। প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ, এ বিচারে না গিয়ে আমাদের সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় আনা উচিত। এক্ষেত্রে আরেকটি পক্ষ মনে করেন, নির্দিষ্ট স্থানে ধূমপানের বিষয়ে উৎসাহিত করলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং আশপাশের পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এ যদি হয় দু'পক্ষের অবস্থান, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে যে অবিরত ধূমপানের সংস্কৃতি চলে আসছে তাকে আমরা কোন চোখে দেখব? ধরুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন দেশের স্বনামধন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশেপাশে। আপনার চারপাশে অন্ততঃ কয়েকদল তরুণ দেখতে পাবেন, যাদের হাতে থাকবে সিগারেট আর গরম চায়ের কাপ। ধূমায়মান চায়ের সাথে নিকোটিনের আস্বাদন! বর্তমান সময়ে ব্যস্ত রাস্তা, খোলা মাঠ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণসহ সকল পাবলিক প্লেসে রয়েছে এমন ধূমপায়ীদের অবাধ বিচরণ। তবে অবাক তথ্য হল এদের সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে। ক্লাসের ফাঁকে কিংবা টিফিনের আড্ডায় তরুণদের হাতে জ্বলছে সিগারেটের আগুন।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘুরে দেখা গেছে, এসব ক্যাম্পাসে সিগারেটের দোকানের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়! এসব দোকানে ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। এছাড়া এসব এলাকায় অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের আনাগোনাও চোখে পড়ার মত। সেসব বিক্রেতাদের অধিকাংশই অল্পবয়সী ছেলেছোকড়া। জীবনের প্রায় সকল ধরনের সুবিধা-বঞ্চিত এসব কিশোর, জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হচ্ছে এ পেশায় আসতে। কথা হয় এমনই এক সিগারেট বিক্রেতা রাজুর সাথে। রাজু থাকে আগারগাঁওয়ের বস্তিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনেকদিন ধরে সিগারেট বিক্রি করে আসছে সে। রাজু জানায়, শুধুমাত্র শিক্ষার্থীই নয়, এসব সিগারেটের ভোক্তার একটি অংশ আশেপাশের এলাকার উঠতি বয়সের তরুণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করে না সেটার মূল্য প্রাপ্তি। আর অনেক ক্ষেত্রে সেই বাকির খাতাটা ধমক কিংবা ভয়ভীতির মাধ্যমে চলে যায় অনাদায়ী সঞ্চিতির কোঠায়। তবু নিতান্ত পেটের দায়ে এ পেশাতেই থাকতে হচ্ছে তাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাধে ধূমপান যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণের চোখে বদলে দিচ্ছে এর মূল্যায়ন। তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত করছে আশপাশের সামগ্রিক পরিবেশ। সর্বোচ্চ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় উঠতি বয়সের শিশু-কিশোররা যখন দেখে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের এমন অবাধ ধূমপান, তখন তাদের অনুপ্রেরণা ঠেকায় কার সাধ্য! প্রকাশ্য এ ধূমপানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তিও নেহায়েত কম নয়। কথাপ্রসঙ্গে এমনই কিছু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জানা গেল, ক্যাম্পাসের ধূমপায়ীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা বন্ধু। তাই তারা প্রতিবাদ ঠিক কিভাবে করা উচিত সেটা বুঝে ওঠা তাদের জন্যে বেশ দুষ্কর। কিংবা প্রতিবাদ করলেও কোনও ফল আসে না এসব ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্যাম্পাসেই আলাদা করে ধূমপানের জন্যে নির্ধারিত স্থানের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ফারুকুল ইসলাম। এতে করে অধূমপায়ীদের ভোগান্তি অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে তার মত। আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হল, অগ্রজদের অবিবেচনাপ্রসূত ধূমপানের অনেকক্ষেত্রেই অনুজদের পরবর্তীতে ধূমপানে আগ্রহী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে উৎসাহী করে তুলছে। তাদের কাছে এটা একটা সাধারণ ঘটনার মত হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। এমন অনেকের সাথে কথা হল যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে ধূমপান করতো না, কিন্তু ক্যাম্পাসের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এখন তাদের নেশায় হাতেখড়ি হয়েছে সিগারেট দিয়ে। ধূমপানের জন্য বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করতে পরিবারের কাছে মিথ্যারও আশ্রয় নিতে হচ্ছে তাদের।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেসে ধূমপান

(বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ২, কলাম ১)

জ ঙ্গি বা দ

ছড়িয়ে পড়ছে মূলধারার শিক্ষাঙ্গনে

দায়বদ্ধতা কার?

জুলকার নাঈন

১৯ অক্টোবর ২০১২। দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন; 'যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তরুণ গ্রেপ্তার।' অভিযোগ - নিউ ইয়র্কের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় বাংলাদেশী ঐ তরুণের সংশ্লিষ্টতা।

অভিযুক্ত যুবকের নাম কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস (২১)। একই রিপোর্টে আরও বলা হয় – এফবিআই কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, নাফিস জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এমনকি ফেসবুকের মাধ্যমেও নাফিস আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। ফেসবুকে একবার নাফিস লিখেছে, 'ছোট কিছু নয়, বড় কিছু করতে চাই। খুব বড় কিছু, যা সমগ্র আমেরিকাকে কাঁপিয়ে দেবে।' আরও উল্লেখ ছিল – '২০০৬ সালে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি এবং ২০০৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে জিপিএ ৪ পেয়ে এইচএসসি পাস করে নাফিস। এরপর নাফিস নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে ছয় সেমিস্টার শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়।'

এভাবেই মূলধারার শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নীরবে বিস্তার ঘটছে জঙ্গিবাদের। ফলাফল, আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ছাত্ররা হচ্ছেন জঙ্গি হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে জঙ্গিবাদের ধারণা কিভাবে প্রবেশ করেছে বা করছে? একদল কিশোরকণ্ঠী বন্ধু বিদ্যালয়ে আসে যারা ছাত্রদের নিজদলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং উগ্রবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণরা সকলে এসব কিশোরকণ্ঠী বন্ধুদের বেশ ভক্ত। কলেজগামী ছাত্রদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ইসলামের নামে সাংগঠনিক দলগুলোর নানান কর্মকাণ্ড। স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠচক্রের আড়ালে চলে অসাংবিধানিক সাংগঠনিক কার্যক্রম। সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত এসব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়।

আজ সকলে নিষিদ্ধ ঘোষিতদের ব্যাপারে সচেতন নন, শুধুমাত্র আতঙ্ক প্রকাশ করে

(বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ২, কলাম ২)

সূত্র: ইন্টারনেট

ইউল্যাবিয়ান ভাবনা
জুন ২০১৩

সূত্রঃ ইন্টারনেট

তখন–এখন

জুলকার নাঈন

ফেব্রুয়ারি জুড়ে শাহবাগে ছিল উপচেপড়া জনতার ভিড়। মাসের শুরুতে একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে সর্বোচ্চ সাজা না দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাত ধরে শুরু হওয়া আন্দোলনের প্রাঙ্গণটির নাম হয়ে ওঠে প্রজন্ম চত্বর। প্রজন্ম চত্বরে নতুন প্রজন্মের সাথে ছিল সকলের একাত্মতা। নতুনের কণ্ঠে ছিল 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই' স্লোগান। জাগরণের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেক শ্লোগান ও কর্মসূচি এসেছে জনগণের জন্য। তখন শাহবাগ প্রসঙ্গে নতুনের ভাবনা ছিল একরকম। এখন এ প্রসঙ্গে রয়েছে ভিন্নমত। শাহবাগ নিয়ে জন্ম নেয়া নবীনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে এ লেখনীতে।

আফিয়া সুলতানা
এমএসজে
আমি শাহবাগের আন্দোলনকে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একটি ভালো ঘটণা হিসেবেই দেখি। যদিও এর অর্জন নিয়ে নানা জনের নানান মত রয়েছে। কিন্তু, এসব অভিমত দেন বড় বড় গুণীজনেরা। আমার ছোট মস্তিষ্কে এত জটিলতা কাজ করে না। কারণ, রাজনীতিতে বরাবরই আমার উৎসাহ কম। শাহবাগ আন্দোলনে একটা রাজপথ আমার চেনা হয়েছে, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোর গলায় কিছু বলা যায়। আরেকটি বিষয় যেটা না বললেই নয় - কিছু মানুষ আছেন যারা সবকিছুতেই সন্দেহের গন্ধ খুজে পান। আমি ঠিক তাদের দলের সদস্যও নই। তাই ঠিক যে দাবীতে শাহবাগে তরুণ সমাজ একত্রিত হয়েছিল, সেটাকে নিছক সন্দেহের খোড়াক যোগাতে কোনও একটা বিশেষ দলের চক্রান্ত বলে মত দিতে আমি রাজি নয়। তবে পাশাপাশি এটাও সত্যি বরাবরই যেকোনও আন্দোলকে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন বহু রাজনৈতিক দল। এবারও যার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু, তাই বলে পুরো আন্দোলনের প্রক্রিয়াকে গাল দেয়াটা বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করেনা।

মাহবুবুল আলম
ইটিই
প্রথমে ভেবেছিলাম এবার কিছু পরিবর্তন হয়তোবা সম্ভব। প্রথম কয়েকদিন টেলিভিশন কিংবা পত্রিকার পাতার একনিষ্ঠ ভোক্তা হয়ে থাকলেও পরের সময়টা ব্যস্ত ছিলাম আন্দোলনে ছুটে যেতে। কিন্তু, এখন শাহবাগ শব্দটির অর্থ খুঁজতে গিয়ে আর ছুটে যাওয়া হয় না। প্রথম পাঁচ-দশদিন পর্যন্ত বলতে পারি, আমি তরুণ হিসেবে আমার মত কিছু তরুণের সাথে ছিলাম। এখন শাহবাগে আমি আমার মত তরুণ খুঁজে পাই না। এখন মনে হয় তরুণ হতে আরও বেশি বয়স হওয়া দরকার। শাহবাগে তারুণ্যের যে নতুন সংজ্ঞা পেলাম তাতে বোধহয় আমি এখনও শৈশবের কোটাই ছাড়াতে পারিনি সম্ভবত।

মোঃ ইফতেখার
এমএসজে
শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ এক নতুন সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু, বর্তমানে চলমান রাজনৈতিক ধারা বলে দেয়, চিরন্তন উপায়ে জনগণের গন্তব্য ধানে ভরা নৌকাতেই। যতই পরিবর্তনের কথাই ভাবি না কেন, সর্বশেষ গন্তব্য পরিবর্তন আদৌ হবে কি না কিংবা সেটা আদৌ সম্ভব কিনা, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহটা রয়েই গেছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, পাশাপাশি যৌক্তিকভাবে একটা প্রশ্ন বারবার আমাকে ভাবায় - ষোল কোটি জনগণ কার পক্ষে? প্রতিটি রাজনৈতিক দল কিংবা খোদ গণজাগরণ মঞ্চ যখন যে কোনও বক্তৃতায় পুরো জনগণকে তাদের দিকে টানেন, সেদিক থেকে দেখলে দেশের জনসংখ্যা তো এতদিনে অন্ততপক্ষে তিনগুণ হয়ে আটচল্লিশ কোটি ছাড়িয়ে যেতো। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব ভাষণে কিছু বলার আগে হয় তাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নয়তো দেশের মোট জনসংখ্যাটা আসলে ঠিক কতটে গিয়ে ঠেকেছে, সেটা নতুন করে আবার মেপে দেখার সময় এসে গেছে বোধ হয়।

ইসরাত জেরিন
এমএসজে
আন্দোলনের জন্য রাজপথ দখল হয়েছিল। যাত্রী সাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছিল অনেকদিন। আমি পরিবর্তনের ধারায় বিশ্বাসী। রাজপথ দখল করে, আইন অমান্য করে অধিকার আদায়ে বিশ্বাসী না। এখন প্রশ্ন জাগে, এভাবে কি আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? নাকি শাহবাগে শুধু বেড়াতে গিয়েছি?

সাবরিনা রহমান
এমএসজে
এখন শাহবাগ আন্দোলন পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক প্ররোচনায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রথমে আমিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে শ্লোগান দিয়েছি। শাহবাগে নীরবতা পালন থেকে গণস্বাক্ষরে স্বাধীন মত প্রকাশ করেছি। মনে হচ্ছে শাহবাগের একাত্মতাকে নিয়ে রাজনৈতিক মহল খেলতে এবং খেলাতে প্রস্তুত। এখন পুরো আন্দোলন যদি হয় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উপায়, তাহলে আমি আমার অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করেছি বলেই মানতে হবে।

তন্ময় চৌধুরী
ইউএসবি
স্বপ্ন দেখছিলাম, দেশটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা পরিবর্তন এবার আসছে। দেশে আমাদের মত প্রায় ৩০ শতাংশ তরুণ বুঝি এবার হাল ধরেই ফেলল। সময়ের শেষে এসে যখন আজ শাহবাগ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ার মুখে, দিবালোকে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখাটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ভাবতে কষ্ট হয় নিছক কিছু 'নাস্তিক' আর 'আওয়ামী' স্টিকার সেঁটে একঘুরে করে দেয়া হল একটা প্রজন্মের দাবীকে। জানিনা আবার কতগুলো বছর পর আবারও এমন একটা সার্বজনীন দাবিতে জাগবে পুরো বাঙালী জাতি। নাকি এই ছিলো শেষ।

বৃষ্টি ঘোষ
মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম
শাহবাগ ইস্যুতে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে নানা কথা হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা সরাসরি সম্প্রচার। টক শো এখনও অনেক হয়। কিন্তু, গণমাধ্যম শাহবাগ ইস্যুতে, কঠোর আন্দোলনের সময় যেভাবে তুলে ধরার প্রবণতা দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল দেশে আর কোন ইস্যুই নেই সংবাদে প্রচারের মতো। শাহবাগ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তার সাথে অন্যান্য ইস্যুগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা গণমাধ্যমের থাকা উচিৎ নয়। যে মাধ্যম গণ-মানুষের, তাতে সকল ইস্যুই সমানভাবে উঠে আসাটাই কাম্য।

মহিউদ্দিন আহমেদ সাগর
এমএসজে
আমরা বোধ হয় অনেকদিন ধরে চুপ ছিলাম। নিজের অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা বা রুখে দাঁড়ানো সবই ভুলতে বসেছিলাম। শাহবাগ আবার নতুন করে বলতে শিখিয়েছে। এ জায়গা থেকে বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে, শাহবাগ সার্থক। কিন্তু, বরাবরের মতো এ সার্থকতা যখন অন্যের ঘরে ফসল তোলার হাতিয়ার হয়ে দাড়ায় তখন সেটা নিতান্ত দুঃখজনক বিষয় হিসেবে দাঁড়ায় আমার সামনে।

তাসনিয়া রহমান
সিএসই
আমি শাহবাগ প্রসঙ্গে তরুণ সমাজের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। জাতীয়তা বোধ যে এখনও বাঙালি তরুণদের মধ্যে আছে, তা শাহবাগের আন্দোলনের মাধ্যমে বোঝা গেছে । রাজনীতি প্রসঙ্গটা হয়ত বিতর্কের মঞ্চ প্রস্তুত করবে, কিন্তু, তরুণ সমাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে শাহবাগে শ্লোগান দিতে যায়নি।

মাহের সায়েদ চৌধুরী
এমএসজে
আমি অবশ্যই যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ বিচার চাই। কিন্তু সেই সুযোগে তারুণ্য কোন রাজনৈতিক মহলের হাতিয়ার কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হোক তা চাই না। আমি শাহবাগের তরুণ কণ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু পেছন থেকে সেই তারুণ্যকে ব্যবহার করে চালানো যে কোন ধরনের রাজনৈতিক অপ-প্রচারণার যে ধারা ব্যক্তিগতভাবে আমি তার তীব্র নিন্দা জানাই।

নিশ্চুপ অপরাজিতা

জুলকার নাঈন

ছোট একটা গল্প। রাতে জেগে থাকা নিশ্চুপ অপরাজিতার গল্প। রাতজাগা তারার জন্য রাতজাগা এক পাখির অপেক্ষা। রাতের পর রাত জেগে থাকে নিশ্চুপ অপরাজিতা। খুঁজে ফেরে নিজ রাতের তারাকে। মধ্যরাত আর গভীর রাতের পার্থক্য না করেই মেয়েটির রাত শেষ হয়। কখন নতুন রাতের দেখা মেলে। কিন্তু, রাতের আকাশে দেখা মেলে না অপরাজিতার খুঁজে ফেরা সে তারার। তবু অপরাজিতা ঘুমে ফেরে না। একমনে খুঁজে ফেরে রাতজাগা তারাকে। অপরাজিতা তাই আজও নিশ্চুপ।

শুরুটা দুজনের দিকে চোখে চোখ রাখা দিয়ে। আরাজ আর অপরাজিতা। শহরের এক কফিহাউজে দু'জন দুটো আলাদা টেবিলে বসে কফি খাচ্ছিল। টেবিল দু'টো ছিল একে অন্যের থেকে কিছুটা দূরে। কিন্তু, ওরা বসেছিল দু'জন দু'জনের দিকে মুখ করে। তাই কফি খাবার সময় দু'জনের চোখে চোখ পড়ছিল। অন্য টেবিলগুলো ছিল যুগলদের জন্য। শুধুমাত্র এই দু'জনই ছিল একা। কফি খেতে তাই কোথাও চোখ পড়েনি দু'জনের। খুব দেখছিল একে অন্যকে। কেমন জানি সব মিলে যাচ্ছিল, একের পর এক। দু'জনের একে অন্যের দিকে মুখোমুখি বসা। চোখে চোখ রাখা। আর তার সাথে কফি খাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা শোনা গেল, আজ কফি-কাপল হয়েছে দু'টি ভিন্ন টেবিলের মানুষ। আজকের কফি-কাপল আরাজ এবং অপরাজিতা। দু'জনেই অবাক হয়ে ঘোষণাটা দেখছিল কফিহউজের বিশাল টিভি স্ক্রীনে। সকলে হাততালি দিচ্ছিল। সেখানে যুগল ছিল অনেক। কিন্তু, ভিন্ন টেবিলের মানুষ কেন আজকের কফি-কাপল? হয়ত চোখে চোখ রাখাটাই কারণ ছিল। কফিহাউজের প্রথম বর্ষপূর্তিতে সপ্তাহজুড়ে চলছিল 'কফি-কাপল অফ দি উইক' শিরোনামের এই কন্টেস্ট। তাই দু'জনের এই নিয়তি।

এক পড়ন্ত বিকেলে বের হয় দু'জনে। একসাথে হেঁটে চলে, কাশবন ঘেঁষে। আপন মনে হেঁটে চলছে দুজন দু'জনার হাত ধরে। অনেকটা সময় পর দু'জন থেমে যায়। দিনের পড়ন্ত আলো দু'জনকে থামিয়ে দেয়। দু'জন দু'জনের মুখোমুখি

কি আর করা! অগত্যা, কফি কাপলের এক টেবিলে বসার পালা। দু'জন একসাথে বসল। একই টেবিলে। আগের মতোই মুখোমুখি। কিন্তু, মাঝখানের দূরত্বটা কমে গেছে বিস্তর। কিছুক্ষণ পর টেবিলে এসে হাজির হল গিফটবক্সের বহরের সঙ্গে স্পেশাল কফি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাধ্যমেই দু'জনের প্রথম পরিচয়। পরিচয়ে আরাজ একজন সদ্য চাকুরে। অন্যদিকে, অপরাজিতা পড়ছে সাহিত্যে। সেদিন খুব একটা কথা হয়নি দু'জনের। তবে সেলফোন নাম্বারটা বিনিময় হয়েছে দু'জনের মধ্যে, এই যা। কোনও এক রাতে, আরাজ নিজ থেকেই ফোন দেয় অপরাজিতাকে। পরিচয় দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে সে। কিছুক্ষণের কথাতেই অপরাজিতা বলে ফেলে, 'এমনটা হবে কখনও ভাবিনি। ভাবতেই অবাক লাগে, তাই না! অদ্ভুত একটা গল্প লেখা হল দু'জনের মধ্যে।' চুপ করে আরাজ শুনে যায় অপরাজিতার কথাগুলো। সাহিত্যে পড়া অপরাজিতার সাহিত্যবোধ থেকেই কথা হতে থাকে দু'জনের। অপরাজিতার কথাগুলো আপন ভাবতে শেখায় আরাজকে। দু'জনের কেউ হয়ত ভুলবে না সেদিনের কফির গল্প।

কফি-কাপলের গল্প নতুন সময় বেছে নেয়। মুলগল্প লেখা হয় রাত জেগে ফেসবুকে। গল্পের নায়ক-নায়িকা সেজে যায় আরাজ-অপরাজিতা। ফোনে খুব একটা কথা হয় না এখন ওদের। ফেসবুকেই পড়ে থাকে দু'জন। আর সঙ্গে কফির মগ। কফির অভ্যাসটা গাঢ় হয়েছে দু'জনেরই। খুব রাত জাগে ওরা। ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাতে গড়ায়। কফির পর কফি শেষ হয়। শেষ হয় রাত। কিন্তু, অপরাজিতা-আরাজের গল্প শেষ হয় না। থেমে থাকে না রাত জাগা। রাত জাগা পাখি আর রাত জাগা তারার সময় না মানা। নির্ঘুম জেগে থাকা ।

ওদের সাথে ফেসবুকও রাত জাগে কফি হাতে। জীবনের ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করে দু'জন। বলা হয় মনের কথা। লেখা হয় ভালবাসার গল্প। ভালবাসার সাগরে ঘরবাঁধার স্বপ্ন। ফেসবুক স্ট্যাটাসগুলোই বলে দেয়, দু'জনের অনুভূতি। বলে দেয় রাত জেগে কফির অনুভূতি। ফুটে উঠে রাত জেগে নীলাকাশ দেখার অনুভূতি। রাত জেগে আঁকা হয় স্বপ্নছবি। আর রাত শেষে এলোমেলো পড়ে থাকে সাহিত্যের বইগুলো। চার্জ শেষে ল্যাপটপ দুটি নিজে নিজেই বন্ধ হয়। মাঝেমাঝে তেলাপোকা উঠে পড়ে কফির মগে। এসব এলোমেলো অভ্যাস গুলোকে মেনে নিতে থাকে দু'জন। এলোমেলো জীবন হয় দু'জনের সঙ্গী।

এক রাতে আরাজ অপরাজিতাকে বলে, এমন রাতগুলো যদি আমাদের না হয়। যদি আমাদের রাত জাগা না হয়, আঁকা না হয় নতুন স্বপ্ন। যদি বলি আমাদের আর একসাথে কফি খাওয়া হবে না। রাত জেগে গল্প লেখা হবে না। বলা হবে না অব্যক্ত কথাগুলো। কি করবে তখন? অপরাজিতার উত্তর, 'ধুর বোকা! তা কি হয়?' আরাজের কঠিন ভাবনাগুলোকে গুরুত্ব দেয়না অপরাজিতা। কিছু না ভেবেই স্ট্যাটাস দিতে থাকে ফেসবুকে। রাত এগিয়ে যায় কঠিন প্রশ্ন নিয়ে।

এক পড়ন্ত বিকেলে বের হয় দু'জনে। একসাথে হেঁটে চলে, কাশবন ঘেঁষে। আপন মনে হেঁটে চলছে দুজন দু'জনার হাত ধরে। অনেকটা সময় পর দু'জন থেমে যায়। দিনের পড়ন্ত আলো দু'জনকে থামিয়ে দেয়। দু'জন দু'জনের মুখোমুখি। প্রথম দিনের মত বেশ দূরত্বে নয়, আজ দু'জন একে অন্যের বেশ কাছে। 'কাল রাতে আমাকে যা বলেছো তা কি সত্যি? তা যদি হয়, আমার কি হবে? সত্যি কি তুমি আর আমার রাতজাগা তারা হবে না? তুমি কি কিছু লুকোচ্ছো?' বল আমায়। তাহলে এতদিন কেন রাত জেগেছ আমার সাথে? কেন সময় দেখনি ঘড়ির কাঁটায়। আজ সময় শেষ। আরাজ তোমার মুখে কেন উত্তর নেই। প্রশ্ন কি সব আমার? তুমি কি এখনও নিশ্চুপ থাকবে? আরাজ নিরুত্তর। শুধু তাকিয়েছিল অপরাজিতার দিকে। শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল অপরাজিতার হাত। অপরাজিতার সকল প্রশ্ন হয়ত শেষ। দিনের শেষ আলো প্রশ্নোত্তর অধ্যায় শেষ করে দেয়। উত্তর পায় না অপরাজিতা ।

আর এখন সময়টা অনেক পেরিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। অপরাজিতার এখন যাওয়া হয় না কফিহাউসে। কফির রং আজ সত্যিই কালো। অপরাজিতা এখন আর ফেসবুকে রাত জাগে না। তার হাতে থাকেনা কফির মগ। আজ ঘড়ির কাটা ঘুরতে ঘুরতে স্পষ্ট সময় দেখায়। সহসা রাত এগিয়ে যায় না মধ্য রাতে। কারণ আরাজ আজ অনেক দূরে। না ফেরার দেশে। সব গল্প অপূর্ণ করে চলে গেছে সে। এখন রাতজাগা পাখির সাথে রাতজাগা তারার কথা হয় না। হয়ত রাত জাগা অপরাজিতা নীলাকাশে রাতজাগা তারাকে খুঁজে পায় না। নির্লিপ্ত চোখে খুঁজে ফেরে রাতজাগা তারাকে। অপরাজিতা তাই আজও নিশ্চুপ। রাতজাগা পাখি তাই খুঁজে ফেরে নিজের পরিচয়। সে পরিচয়ে আজ অপরিচিত এক মেয়ে নিশ্চুপ অপরাজিতা।

সূত্র: ইন্টারনেট

ছবির গল্প

জুন ২০১৩

প্রজন্ম

'৫২' আমার মায়ের মুখের বাংলা ভাষা। '৬৯' বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান। '৭১' মুক্ত আকাশে সাড়ে সাত কোটি স্বাধীন পাখির উড়বার অধিকার । স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পর আবার সমাজের জঞ্জাল মুছতে এক গণদাবী। প্রজন্ম নামের হাতিয়ার আজ জেগে উঠেছে। দৃঢ় কণ্ঠে তরুণেরা চলেছে নতুন পথে। এ নতুন, সমাজের কালিমা মুছবে বর্তমানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

লাল সবুজের দেশে, চিরসবুজ পতাকার লাল বৃত্ত তাদের পরিচয়। সে পরিচয়ে আজ ওরা আবার লিখতে শুরু করে। কলমের কালিতে লিখে ধিক্কার জানায়। তাদের একাত্মতা

ষোল কোটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের সাথে। দাবি তাদের একটাই – দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে। অন্ধকার শেষে আলোর অধ্যায় শুরু করবে ওরা। এ প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কথা দিচ্ছে, 'তোমার বাংলাদেশ হবে মুক্ত'।

চিত্রগ্রাহক: মোঃ রিফাত ইসলাম
গল্প: জুলকার নাঈন

সম্পাদকীয়

জুন ২০১৩

সম্পাদকীয়

আর এম জি শিল্পের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারা দায়ী?

সূত্রঃ ইন্টারনেট

ডেনিম কিংবা পোলো ব্র্যান্ডের একটি শার্টের জন্য বাংলাদেশে উৎপাদন খরচ কত পড়ে? বিপরীতে আমেরিকাকে শার্টটি উৎপাদনে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়? এ তুলনা হয়ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর খোলাসা করবে। এমনকি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পটি টিকে থাকার জন্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অবস্থানগুলোকে তুলে ধরবে। যেখানে দেশের পোশাক শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে সেখানে দেশের মালিকগোষ্ঠী পুঁজিবাদের সুযোগ গ্রহণ করছে। অপরদিকে, পৃথিবীর সর্বনিম্ন শ্রমিক মজুরি-কাঠামো পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ভুক্ত দেশগুলোকে সর্বনিম্ন খরচে পোশাক ক্রয়ের সুবিধা দিয়ে ২য় পোশাক রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় স্থান দিয়েছে বাংলাদেশকে।

ডেনিমের একটি শার্ট প্রস্তুতে আমেরিকাকে কাঁচামালের খরচ সহ অন্যান্য প্রক্রিয়া বাবদ ব্যয় করতে হয় ৫ ডলার, সেখানে তাদের শ্রমিক খরচ গুনতে হয় ৭.৪৭ ডলার। এছাড়া সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একটি শার্ট উৎপাদনে মোট খরচ পড়ে ১৩.২২ ডলার। শপিং মলে শার্টটির বিক্রয় মূল্যে না গেলাম। অন্যদিকে, বাংলাদেশে ডেনিম শার্ট প্রস্তুতে কাঁচামাল বাবদ খরচ পড়ে ৩.৩০ ডলার এবং আমাদের পোশাক শ্রমিক পায় দশমিক ২২ডলার, যা আমেরিকানের শ্রমের মূল্যের তুলনায় প্রায় চৌত্রিশ গুন কম। প্রায় দশ ডলার কম খরচে বাংলাদেশ একটি ডেনিম পণ্য প্রস্তুত করে মাত্র ৩.৭২ ডলারে। এ দেশে এত কম খরচে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে শুধু মাত্র সর্বনিম্ন পারিশ্রমিকের কারণে। ডলারের হিসাব থেকে টাকার অংকে হিসাব করে দেখা যাক। যদি ইউরোপের শপিং মলে এক হাজার সত্তর টাকা সমমূল্যের পোলো ব্রান্ডের একটি শার্ট বিক্রি হয়, তাতে বাংলাদেশী মালিক পক্ষ ৪৮.৭২ টাকা লাভের সুযোগ হয়; আর বাংলাদেশের পোশাক কর্মীর ভাগ্যে থাকে ১০.০৮ টাকার হিস্যা। মোটকথা, এ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ক্রয়কারী দেশগুলো এ দেশ থেকে পোশাক নিতে বেশি আগ্রহী।

৫ এপ্রিল ২০১৩। তৈরি পোশাক শিল্পের ইতিহাসে ঘটে বিশ্বের ভয়াবহতম দুর্ঘটনা। সাভারের রানা প্লাজার ভবন ধ্বসে পোশাক শিল্পের ১১শ'র বেশি শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। গত বছর আগুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরের তাজরীন ফ্যাশন লিমিটেডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ১১২ জন শ্রমিক। তাজরীনের অগ্নিকান্ডের দু'মাস পর প্রাণহানি ঘটে মোহাম্মদপুরের স্মার্ট ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ডে সাত নারী শ্রমিকের । ২০০৫ সালে স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ধস ৮৫ শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সম্প্রতি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হচ্ছে। পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। মার্কিন টেলিভিশন সিবিএস নিউজ চ্যানেলে এ প্রসঙ্গে প্রচারিত হয়েছে বিদ্রূপাত্মক ও নেতিবাচক সংবাদ। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের হুমকি ছাড়াও সর্বশেষ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) শুল্কমুক্তি ও কোটা সুবিধা প্রত্যাহারের কথায় উদ্বেগ জানিয়েছেন তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্টরা।

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নিয়ে যে মনোভাব প্রকাশ করছে, তাতে এটা অন্তত স্পষ্ট যে শিল্পটি নিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। সকলের মত একই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকপক্ষও। তাদের অভিযোগ, বেশকিছু দিন ধরে ঘটা হাতেগোনা দু'একটি ছাড়া বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে পরিকল্পিতভাবে গার্মেন্টস খাতকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। বর্তমানের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি এ ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের ৮০ ভাগই দখল করা এ শিল্প মুখ থুবড়ে পড়লে দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য কম রপ্তানি হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাধিক গার্মেন্টস মালিক। এ অবস্থায় চলতি বছর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ২০ বিলিয়ন ডলার পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মজুরি থেকে শুরু বিভিন্ন ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের পোশাক শ্রমিক ও কারখানার মালিকদের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৩৬.৫০ ডলার, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোতে শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো আমাদের শ্রমিকদের বেতনের দুই থেকে তিন গুণ। বিভিন্ন বিদেশি মহল থেকে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মজুরি-কাঠামো পুনর্নির্ধারনের দাবি এসেছে। সরকার, শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিজিএমইএ সকলে মিলে হয়ত ঐকমতে পৌঁছাবে। চলমান এ অস্থিরতারও অবসান ঘটবে শীঘ্রই। কিন্তু, বাংলাদেশ যদি বলে সকল অব্যবস্থাপনার অবসান সহ শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করে প্রতিটি পোশাকপণ্য উৎপাদনে মাত্র ১ ডলার বেশি খরচ বাড়াবে, তাতে কতসংখ্যক ক্রয়কারী দেশের ক্রেতা বিমুখ হবেন সে ভাবনা কিন্তু পেছনে থেকেই যায়।

ক্যাম্পাস ধূমপানের অবাধ

(প্রথম পাতার পর)

শাস্তিযোগ্য ও জরিমানাযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য। ঐ আইনের মাধ্যমে যেসব জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত সেগুলো হচ্ছে - সম্মিলিতভাবে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার স্থান বা ভবন। যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ, খেলার মাঠ, বিভিন্ন অফিস, বিপণি বিতান, বাজার, জনসমাবেশ, মেলা, বাস স্ট্যান্ড ও বাসযাত্রীদের দাঁড়ানোর লাইন এবং পাবলিক টয়লেট। তবে এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন কিংবা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম দুটোর কোনোটিই চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গন এবং তার আশপাশের পরিবেশ হওয়া উচিত জীবন গঠনের ও জ্ঞানচর্চার এক অবাধ ক্ষেত্র। ধূমপানের অবাধ ক্ষেত্র নয়। ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে ধূমপানের অবাধ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। ক্যাম্পাসভিত্তিক সচেতনতার পাশাপাশি ধূমপায়ীদের মাঝে সচেতনতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে এ সমস্যার সমাধান।

জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে পড়ছে

(প্রথম পাতার পর)

থাকেন মাঝে মধ্যে। অভিভাবকরাও কখনও ভেবেছেন কি? কিভাবে তাদের সন্তানেরা এসব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই বা কতটুকু তৎপর এ প্রসঙ্গে? অন্যদিকে এসব সংগঠনগুলো সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের মতবাদের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে অবিরত। তাদের দৃষ্টি আজ স্কুলপড়ুয়া ছাত্রদের বালক সুলভ সরলতার প্রতি, কলেজ পড়ুয়াদের একাগ্রতার প্রতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গামীদের মেধার প্রতি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে, এ সংগঠনগুলো অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দলে টেনে থাকে। বপন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত কার্যক্রমের প্রথম বীজ। এই একটি বিশেষ কারণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে বহুগুণে। জঙ্গিবাদ বিস্তারের পেছনে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে ব্লগার রাজীব হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি।

২ মার্চ ২০১৩। দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদন - 'নর্থ সাউথের গ্রেপ্তার পাঁচজনের ছাত্রত্ব স্থগিত'। সংবাদ বিবরণীতে বলা হয় - 'আজ ডিবি কার্যালয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ডিবি পুলিশ মোঃ ফয়সাল বিন নাঈম ওরফে দীপ (২২), মোঃ মাকসুদুল হাসান অনিক (২৩), মোঃ এহসান রেজা রুম্মান (২৩), মোঃ নাঈম সিকদার ইরাদ (১৯) ও নাফিস ইমতিয়াজকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাঁচজনই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র।'

প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে শত নিয়মকানুনের বেড়াজালে বেড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসব সংগঠনের সাথে জড়িত হয়? আজ যে ছাত্রের নামের আগে মেধাবী উপমা দেয়ার কথা ছিল, সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে জঙ্গিবাদী কিংবা মৌলবাদী বিশেষণ। এসব উপাধি যদি দেশের প্রচলিত রাজনীতির জোয়ারে গা ভাসানো ছেলেদের দেয়া হত, খুব কিছু একটা আসতো-যেতো না। কিন্তু, অনেক শ্রমলব্ধ কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা ছাত্রের ক্ষেত্রে তা কতটুকু সহনীয়।

প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এর যথার্থ উত্তর মেলে না। উত্তর পাওয়া যায় না অভিভাবকের কাছেও। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত। অভিভাবকদের দায়িত্ব শুধু ভাল স্কুল-কলেজে সন্তানকে পাঠানো নয়, দায়িত্ব সন্তানদের প্রতিটি গতিপথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সন্তানকে দূরে ঠেলে না দিয়ে উচিৎ তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিংবা মনিটরিং শুধু ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। প্রয়োজন গভীর পর্যবেক্ষণের। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, সহপাঠী সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে জঙ্গিবাদের কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত একটি সুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য। ত্যাগ করতে হবে এড়িয়ে চলার প্রবণতা। এ দাবি যেমন সময়ের প্রতিটি সচেতন মানুষের; এর দায়িত্বও আমাদের সকলের।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো, উপদেষ্টা সম্পাদক: বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, সম্পাদক: জুলকার নাঈন (এমএসজে), ইউল্যাবিয়ান দল: এ এস এম রিয়াদ (এমএসজে), সানজিদা হক (এমএসজে), সজল বি রোজারিও (এমএসজে), আদিলুর রহমান (এমএসজে), জান্নাতুল ফেরদৌস (এমএসজে), রাকিবুল হাসান (এমএসজে), মোহাম্মাদ শানানুজ্জামান অংকন (ইউএসবি), জাহিদ গগন (এমএসজে), ফয়সাল আহমেদ (ইউএসবি), ছবি সংগ্রহ: ইউল্যাবিয়ান ফটো আর্কাইভ, নকশা ও অঙ্গসজ্জা: থ্রিআরএমসি, মুদ্রণ: নিউ স্বদেশ মুদ্রায়ণ। পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনার মতামত পাঠাতে পারেন এ ই-ঠিকানায়: theulabian@ulab.edu.bd

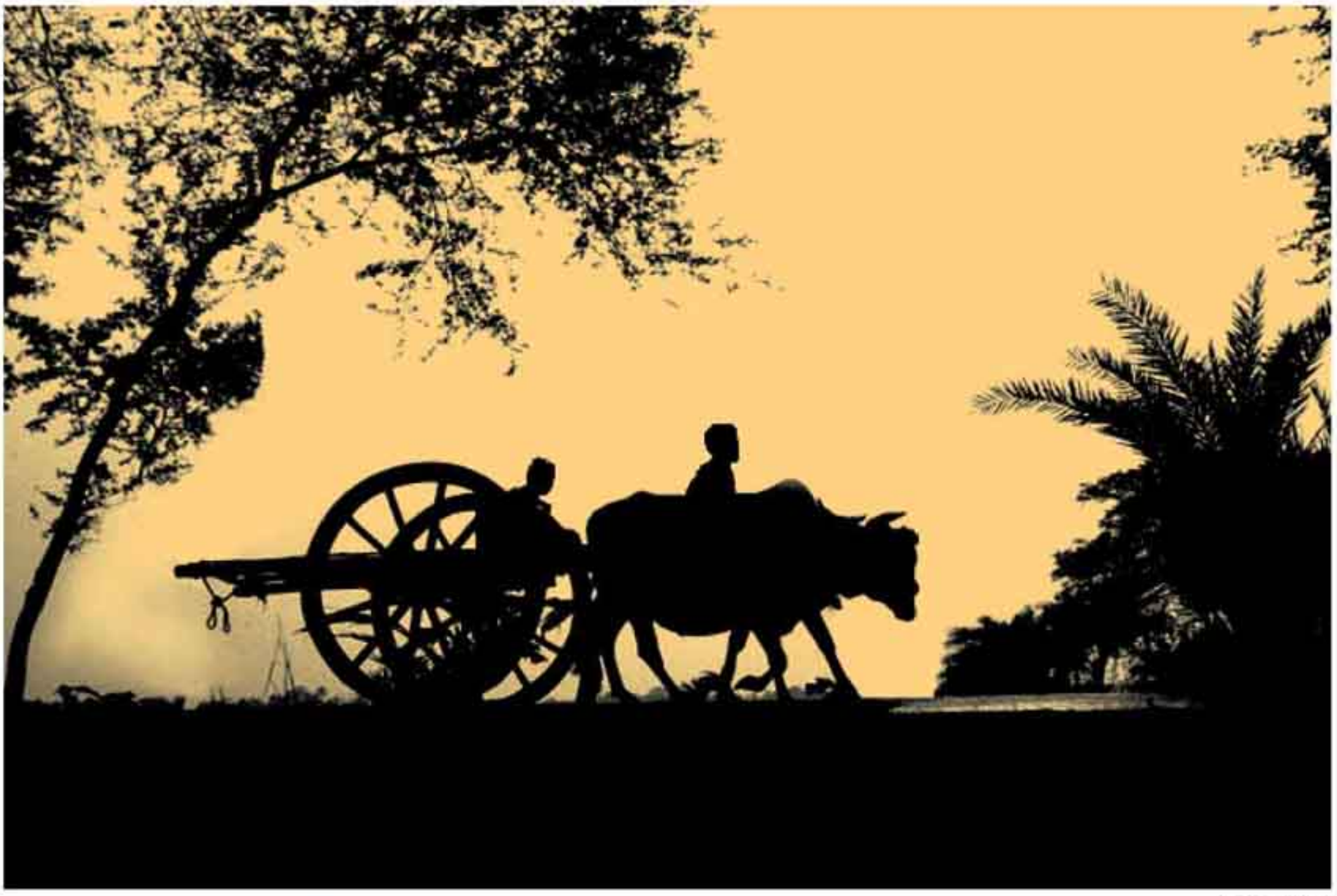

সূত্র: বেঙ্গল পিক্স

হারিয়ে যাচ্ছে ভাওয়াইয়া গান

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

'ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরে'

আব্বাস উদ্দিনের সেই চিলমারীর বন্দর আজও আছে, কেবল সময়ের স্রোতে বিলীনের পথে আমাদের লোকসংগীত। একটা সময় ছিল যখন উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জের মানুষের যাতায়াতের এক মাত্র মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি কিংবা মহিষের গাড়ি। দুর-দূরান্তের পথ ধরে চলতো গরুর গাড়ি। আর উদাস গাড়িয়ালের কণ্ঠে ধ্বনিত হত ভাওয়াইয়া গান। আধুনিক জীবনধারা ও নাগরিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষগুলোর পাওয়া না পাওয়া, আনন্দ বেদনা বিমূর্ত হতো সে সকল গানের সুরে ও ভাষায়।

বছর পাঁচেক আগেও গ্রামের হাট-বাজার গুলোতে বসতো গানের আসর। একতারা হাতে উদাস বাউল গান গাইতো। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, সহমর্মিতা, জীবনবোধ এবং সর্বোপরি মানুষের প্রাণশক্তি জাগ্রত করার অসীম ক্ষমতা ছিল এসব গানে।

ভাওয়াইয়া গানের আবেদন ও কাঠামো আর সব লোকসঙ্গীত থেকে বেশ খানিকটা আলাদা ধাঁচের। এ গানের সকল উপাদান আশপাশের জগত থেকে নেয়া। নর-নারীর প্রেম, গণমানুষের পদাবলি, আর শ্রমজীবী মানুষের হাহাকারই সেখানে প্রাধান্য পায়, যেখানে বিমূর্ততার কোনও সুযোগ নেই। উত্তরের প্রকৃতি রুক্ষ। এখানকার মানুষের জীবনযাপনও খরস্রোতা তিস্তার মতই। মইষাল কিংবা চ্যাংড়া বন্ধুর কণ্ঠেও তাই চড়া সুর বাজে। মহাজনের হাজার বছরের শোষণে পিষ্ট কৃষকের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়,

'হামার ফসল হামার খাটনির
দাম বুঝিয়া নেমো
না হলে হালুয়া পেন্টির ডাঙ্গোত
এবার ঠিক করিয়া দেমো।'
(মুক্তিহরন সরকার)

কিংবা নিথুয়া পাথারে একটি নারী হৃদয়ের কাছে জর্জরিত গ্রামীণ বংশীবাদক যুবকের আহাজারি...

'আমেনা কম তোরে ডাকি
মোর জেবনের কি থুছিস বাকি'

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
উড়িয়া যায়রে চকোয়া পঙ্খি
বগীক বলে ঠারে
তোমার বগা বন্দী হইছে
ধরলা নদীর পারে

গাড়িয়ালের গরুর গলার ঘন্টি শুনে আকুল হয়ে ঘর থেকে বের হয় অভিমানী কিশোরী। সারাদিনের কাজ শেষে তার তরুণ বন্ধু সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঘরে ফেরে। কিশোরীর মনে তখন অভিমান আর অভিযোগের পাহাড়।

'মইষ চড়ান মোর মইষাল বন্ধু রে
বন্ধু কোন বা চরের মাঝে
এলা কেনে ঘন্টির বাজন
না শোনম মুই কানে মইষাল'

আবহমান বাংলার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী চিরকালই অবরুদ্ধ। দূর পরদেশে তার প্রেমিক পুরুষ হয়তো আটকা পড়ে যায় চাকরির ফাঁদে। দু'জন হয়তো আশায় থাকে ডাহুক কিংবা চকোয়া পাখির। কখন সে কাঙ্ক্ষিত জনের কাছে পৌঁছে দেবে তার মনের খবর? তখন আব্বাস উদ্দিনের দরাজ গলায় ভেসে আসে সে সুর।

'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।
উড়িয়া যায়রে চকোয়া পঙ্খি
বগীক বলে ঠারে
তোমার বগা বন্দী হইছে ধরলা নদীর পারে'

শহুরে মানসিকতা আর নগর-সংস্কৃতির আধিপত্যের কারণে হাজার বছরের ঐতিহ্য ভাওয়াইয়া সম্পদ এখন বিলুপ্তির পথে। লোকভাণ্ডারের আশ্চর্য এসব সৃষ্টি সংরক্ষণে নেই কোনও উদ্যোগ। গবেষকদের আন্তরিক পদক্ষেপ একেবারেই নগণ্য। চরম অবহেলা আর অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় জীবন নির্বাহ করছেন ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীরা। একইভাবে গণমাধ্যমগুলোতেও ভাওয়াইয়া গানের প্রতি রয়েছে চরম অবহেলা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মই হতে পারে এ গর্বিত ঐতিহ্যের ধারক। কেননা নতুনরাই পারে যে কোন উত্তরাধিকারকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলতে।

শত বছর শেষে রোকেয়া

জুলকার নাঈন

গত ১৪ মার্চ ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব) এর মিলনায়তনে প্রদর্শিত হল নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সাখাওয়াত হোসেনের জীবনী ও তাঁর গড়ে তোলা শতবর্ষী 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাতা ইকবাল বাহার চৌধুরী।

প্রামাণ্যচিত্রটিতে ফুটে উঠেছে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক নারীর দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার গল্প। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেগম রোকেয়ার আদর্শ, যিনি নারীদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন অর্ধাঙ্গী হিসেবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের প্রয়োজনে নারীদের স্বাবলম্বী হবার গুরুত্ব। ৪৫ মিনিট দীর্ঘ প্রামাণ্যচিত্রে নারী জাতির উন্নয়নে পর্দাপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজের ক্ষমতা অর্জনের গল্প ফুটে উঠেছে।

প্রামাণ্যচিত্রে আরও দেখানো হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর শতবর্ষ

উদযাপনের কথা এবং সেখানকার বর্তমান পাঠ কর্মসূচি। জানা গেছে, বিদ্যালয়টি প্রথমে উর্দু মাধ্যমে পাঠদান শুরু করে, বর্তমানে সেখানে উর্দু সহ বাংলা, ইংরেজি এ তিন মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, ইউল্যাবের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক ড. জহিরুল হক এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নির্মাতা ইকবাল বাহার চৌধুরী উপস্থিত দর্শকদের সামনে প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাণলব্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করেন।

বাংলা সিনেমা দেখতে

(পৃষ্ঠা ৮ এর পর)

আশা করবেন যে আপনার জন্যে মানসম্মত সিনেমা বানানো হবে? যতদিন না আমরা সবাই কিছু না কিছু অবদান রাখবো ততদিন কিভাবে আশা করবো যে, বাংলা সিনেমা ভালো হবে!

বর্তমানে নতুনদের ওপর ভর করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সফলতার পথে হেঁটে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বেশ কিছু ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, যে চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন দিগন্ত তৈরি করবে। দর্শক আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরবে। ফলে বাণিজ্যিক দিক থেকে জেগে উঠবে চলচ্চিত্র মাধ্যম। কাজের কথা হচ্ছে, বাংলা সিনেমায় নতুন তরীর পালে যে হাওয়া লেগেছে তার পাশে আমরা না থাকলে সে তরী হয়তো আবারো হবে দিকহারা।

তরুণ নির্মাতাদের স্বপ্ন

সজল বি রোজারিও

অনেক তরুণ চোখে একদিন পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়ার স্বপ্ন। তরুণ এ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলেও, স্বপ্ন দেখার কমতি নেই। এ স্বপ্নাতুর তরুণদের দেখা স্বপ্নগুলোকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, প্রথমবারের মত ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এ আয়োজন করা হয় 'ইউল্যাব স্টুডেন্টস শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এন্ড কম্পিটিশন-২০১৩'। ইউল্যাব ফিল্ম ক্লাবের আয়োজনে এ উৎসবে প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'লাভ এন্ড অ্যাফেকশান'। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের ঠিক আগ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের উপদেষ্টা বিকাশ সি$_{এইচ}$ ভৌমিক অতিথি ও দর্শকদের স্বাগত জানান। ক্লাব উপদেষ্টা আগামী বছর 'ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' আয়োজনের ঘোষণা দেন।

উৎসবে সকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত ছিল ইউল্যাব মিলনায়তন। দুটি পর্যায়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে। প্রথম ভাগে ইউল্যাবের শিক্ষার্থীদের নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মোট নয়টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় এ পর্যায়টিতে। প্রতিটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষে ছিল পরিচালক ও কলাকুশলীদের সাথে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পর্ব।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর ছিল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া চলচ্চিত্রগুলোর প্রদর্শনী। প্রদর্শন শেষে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পরিচালক দীপঙ্কর দীপন চলচ্চিত্র বিষয়ে তার নিজস্ব ভাবনা শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরেন। এর পরপরই প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক আনোয়ার হোসেন সেরা তিনটি চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাজমুল হাসান পিয়াসের 'ভালবাসার সৃষ্টি', দ্বিতীয় সজল বি রোজারিও এর 'নিভৃতে' এবং তৃতীয় শেখ আবদুল্লাহ আল কায়সারের 'এন্ড অব লাভ'। 'কোলাহলের বাইরে' শীর্ষক চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার অর্জন করেন আল নাহিয়ান। অনুষ্ঠানের শেষে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে সনদপত্র ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি দীপঙ্কর দীপন, প্রধান বিচারক আনোয়ার হোসেন ও ইউল্যাব ফিল্ম ক্লাবের উপদেষ্টা বিকাশ সি$_{এইচ}$ ভৌমিক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা বানান প্রতিযোগিতা

আদিলুর রহমান

গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ইউল্যাবের বাংলা অধ্যায়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বানান প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মোট একশত দু'জন শিক্ষার্থী। প্রতিযোগিতায় মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর বেগম জাহান আরা এবং ড. তপতী রানী সরকার। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণকারী বত্রিশটি দলের ভেতর থেকে সেমিফাইনালের জন্য আটটি দলকে নির্বাচন করা হয়। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ও শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। সব দলকে পেছনে ফেলে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে 'ঋ' দল। বিজয়ী দলের সদস্যরা ছিলেন- মোহাম্মাদ শান, শাবনান রহমান, এবং শানানুজ্জামান। অনুষ্ঠানের সমাপনী দিবসে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলা অধ্যায়ন কেন্দ্রের উপদেষ্টা প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম এবং ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান ।

বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় হাস্যোজ্জ্বল দুই বিজয়ীর সঙ্গে প্রখ্যাত নজরুল গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম এবং ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান

মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ চিত্র প্রদর্শনী

জান্নাতুল ফেরদৌস

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ২৫ মার্চ ইউল্যাব ইয়েস আয়োজন করে 'মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ চিত্র' শীর্ষক এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেস-এর প্রফেসর আব্দুল মান্নান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফয়জুল ইসলাম। প্রদর্শনীটিতে স্থান পায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রকাশিত বেশক'টি আলোকচিত্র।

ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল প্রদর্শনীটি। প্রদর্শনীতে ঘুরতে আসা বিশ্ববিদ্যালয়টির মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী আতাউর রহমান তার অনুভূতি সম্পর্কে বলেন, 'এ ধরনের প্রদর্শনী দেখার সুযোগ আমার আগে কখনও হয়নি। সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। নতুন করে অনেক কিছু জানার সুযোগও হয়েছে।' আয়োজনটি প্রসঙ্গে ইউল্যাব ইয়েসের দলনেতা মোঃ নাহিদ আলম বলেন, প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত। পাশাপাশি এ আয়োজন আমাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস' ।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব ইয়েসের উপদেষ্টা তাহমিনা আনোয়ার।

ইউল্যাবে বসন্ত বরণ ও ক্লাব ডে

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রামচন্দ্রপুরে অবস্থিত ইউল্যাব-এর স্থায়ী ক্যাম্পাস খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত বরণ উৎসব ও ক্লাব ডে। সকাল ন'টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বসন্ত বরণের সকল আনুষ্ঠানিকতা। একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে পরিচালিত হয় স্ব-স্ব ক্লাবের অনুষ্ঠান কর্মসূচী। ফাল্গুনের এই আগুনঝরা দিনে প্রকৃতির দাবদাহকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সকল বিভাগের শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

মনে বসন্তের ফুরফুরে আমেজ নিয়ে বাসন্তী সাজে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তেরটি ক্লাবের সদস্যরা নাচ-গান আর অভিনয়ে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে। দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের সকল ক্ষেত্রে ছিল শতভাগ বাঙালিয়ানার ছাপ। হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রত্যয়ে ছিল নাগরদোলাসহ নানা খেলার আয়োজন। বিভিন্ন স্টলে পসরা বসেছিল হরেক রকম পিঠা ও দেশীয় খাবারের । এছাড়া প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন মুগ্ধ করে সবাইকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলে আয়োজনের আনুষ্ঠানিকতা গুটিয়ে আনলেও মনের ভেতর থেকে যাওয়া বাসন্তী আমেজকে সঙ্গী করে বাড়ি ফেরে শিক্ষার্থীরা।

মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ চিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ইউল্যাব রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফয়জুল ইসলাম ও ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেস এর প্রফেসর আব্দুল মান্নান

ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির ও কবি নজরুল ইসলামের বাংলাদেশে আগমনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৮ ও ২৯ মে ২০১৩ ইউল্যাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় 'ইউল্যাব বইমেলা-২০১৩' । স্বল্প পরিসরে সুপরিকল্পিত এ মেলাটিতে অংশ নেয় 'ইউল্যাব প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র' সহ মোট পাঁচটি প্রকাশনী। প্রকাশনী গুলো হচ্ছে- বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, পাঠক সমাবেশ, কাগজ প্রকাশনী ও ইউল্যাবের নিজস্ব প্রকাশনা 'ইউল্যাব প্রকাশনী ও বিক্রয় কেন্দ্র' । প্রতিটি স্টলে বেশ সুলভ মূল্যে বিক্রি হয় মূল্যবান বেশ কিছু বই।

ইউল্যাব বইমেলা ২০১৩

২৮ মে, মঙ্গলবার, সকাল ১০টায় বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর প্রেসিডেন্ট কাজী শাহেদ আহমেদ, ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান, প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আল নাহিয়ান।

সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিত অনুষ্ঠানটি উপস্থিত অতিথিদের মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য দ্বারা অলংকৃত হয় । সবশেষে ফিতা কেটে 'ইউল্যাব বইমেলা-২০১৩'-এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর শামসুজ্জামান খান।

ভৈরব

(পৃষ্ঠা ৮ এর পর)

ভৈরব উপন্যাসের কাহিনী পাঠকহৃদয়ে গেঁথে যাবে। উপন্যাসটির মাধ্যমে পাঠক সমাজের প্রাণ খুঁজে পাবে। উপন্যাসটির প্রতিটি দৃশ্য এতোটাই সাবলীল, যার দৃশ্যায়ন খুব সহজেই পাঠক মনকে আন্দোলিত করবে। প্রতিটি দৃশ্য যেন একাত্তর বছর ধরে ভৈরবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেবে। দৃশ্যপট যেন কুঠারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানের গল্প। সাহসিকতা যেন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আদর্শ। আর সবমিলিয়ে, লেখক তার সার্থকতা অর্জন করেছেন পাঠকের মনে চরিত্রটিকে তার সমকালীন বাস্তবতার মিশেলে সার্থকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে।

ইউল্যাব বারতা

জুন ২০১৩

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম

ইউল্যাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উদ্‌যাপন

রাকিবুল হাসান

১৭ মার্চ দিনটি অন্য আর দু'চারটা দিনের মত সাদামাটা নয়। অন্ততপক্ষে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে ৭ মে (২৫ বৈশাখ) বা ২৫ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ)–এর মতই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২০ সালের এ দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক মুক্তিদাতা। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দিনটি উদযাপনে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ইউল্যাব-এ আয়োজন করা হয় আলোচনা অনুষ্ঠান।

ইউল্যাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেস এর প্রফেসর আব্দুল মান্নান। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ গড়ায় তরুণদের নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমিরেটাস রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল (অবঃ) ফয়জুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সলিমুল্লাহ্ খান, প্রফেসর সাজ্জাদ হোসাইন, প্রফেসর রেজাউল করিম মজুমদার এবং ড. জহিরুল হক। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমানের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য সারা দেশে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে দিনটিকে উদযাপন করেছে দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন।

তুতাইল ১৯৭১-২০১২

ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক

ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গত ৩ এপ্রিল আয়োজন করা হল দেশবরেণ্য আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেনের 'তুতাইল ১৯৭১-২০১২' শীর্ষক একটি একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটিতে স্থান পায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তোলা ত্রিশটি আলোকচিত্র। প্রদর্শনীর প্রতিটি ছবি বর্তমান সময়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করে বলে জানান আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান। উদ্বোধনী এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম। ইউল্যাব এমএসজে-এর প্রধান ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো প্রদর্শিত আলোকচিত্রগুলোর উপর একটি বিশ্লেষণী বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধনের একটি পর্বে শিল্পী আনোয়ার হোসেন 'তুতাইল টুডে' শীর্ষক একটি স্লাইড শো উপস্থাপন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্র 'আগামী'। গত ৩ থেকে ৫ এপ্রিল ক্যাম্পাস 'এ' লবি এবং ৬ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ক্যাম্পাস 'বি'র লবিতে প্রদর্শনীর ছবিগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

প্রদর্শনীতে উপস্থিত অতিথির সঙ্গে বরেণ্য আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন ও ইউল্যাব এমএসজে'র বিভাগীয় প্রধান ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো

উদ্‌যাপিত হল স্বাধীনতা দিবস ২০১৩

শানানুজ্জামান অংকন

স্বাধীনতার ৪২ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১ এপ্রিল এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইউল্যাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমানের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ইউল্যাবের প্রধান ক্যাম্পাস মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল অব বিজনেস এর প্রফেসর আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে এতে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর হামিদুল হক। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। নিজের অনুদিত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' আবৃতি করে শোনান প্রফেসর কায়সার হামিদুল হক। অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয় গীতা মেহতা নির্মিত তথ্যচিত্র 'ডেটলাইন বাংলাদেশ'। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কাজী শাহেদ আহমেদ। অনুষ্ঠান শেষে কাজী শাহেদ আহমেদ স্বাধীনতা বিষয়ে ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের প্রণীত 'স্বাধীনতা ২০১৩' শীর্ষক একটি দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করেন। উল্লেখ্য দেয়াল পত্রিকাটিতে ইউল্যাব এর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও বর্ষের শিক্ষার্থীদের লেখা ও আঁকা কবিতা, ছোট গল্প, ছোট নিবন্ধ, এবং কার্টুন প্রকাশিত হয়।

'স্বাধীনতা ২০১৩' দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করছেন ইউল্যাব ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কাজী শাহেদ আহমেদ

ভিতরগড় দূর্গনগরী

ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক

দেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড় জেলাধীন ভিতরগড় উপজেলায় এবার মিলেছে প্রাকমধ্যযুগীয় বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় গত ৬ মে থেকে শুরু করে ১৭ মে পর্যন্ত খনন কাজ পরিচালনা করে এ বসতবাড়ি আবিষ্কার করা হয়। ইউল্যাব জিইডি'র এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য পাস্ট শীর্ষক কোর্সের অধীনে পাঠরত ২১ জন শিক্ষার্থী সেখানে অনুসন্ধান কাজে সহযোগিতা করছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়সূত্রে জানা যায়। স্থানীয়সূত্রে জানা যায়, দূর্গনগরী ভিতরগড়ে মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে আসছে ইতিহাস। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে নির্মিত ভিতরগড় মহারাজার অধীন কারো বসতবাড়ির অংশবিশেষ।

অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত ইউল্যাবের অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর শাহনাজ হুসনে জাহান বলেন, স্থাপনাটির ধরন ও গঠনশৈলী দেখে মনে হচ্ছে, এটি ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে নির্মিত বসতবাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তীতে আমাদের এ গবেষণা অব্যহত থাকবে। পরবর্তী গবেষণায় আরও যেসব তথ্য উপাত্ত উপলব্ধ হবে সেগুলোর বিচারে এ বিষয়ে হয়তো আরও নিশ্চিত হয়ে বলা যেতে পারে এখানকার এসব স্থাপনার বিষয়ে। প্রফেসর শাহনাজ অবিলম্বে ভিতরগড়ের এ এলাকাটিকে বাংলাদেশের অন্যতম হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভিতরগড়ের অপরিসীম গুরুত্ব থাকলেও সরকারিভাবে এটিকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। যার ফলে স্থানীয় জনগণের যেমন স্থানটি সম্পর্কে সচেতনতায় রয়েছে অভাব, ঠিক তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের পর্যটকদের দৃষ্টিতেও অঞ্চলটি পরিচিতি পাচ্ছেনা গুরুত্ব সহকারে। তবে আশা করছি সরকার অতি দ্রুত এ বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করলে জাতি দেশের ইতিহাসের একটি অনাবিষ্কৃত অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।

কোর্সটিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একজন এমএসজে-এর শিক্ষার্থী আফজাল সিদ্দিক সন্ত ইউল্যাবিয়ানকে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশে বলেন, ছেলেবেলা থেকেই প্রত্নতত্ত্ব মানেই মনে হতো ইন্ডিয়ানা জোন্‌স কিংবা লারা ক্রফটের দুঃসাহসিক অভিযান। কিন্তু, বাস্তবে এরচেয়ে বহুগুণে সাদামাটা আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় যে কতটুকু রোমাঞ্চকর, তা শুধু একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীই বলতে পারে।

আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন

জুলকার নাঈন

আদিবাসী নারী সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে গত ৩১ মার্চ ইউল্যাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'ইন্ডিজেনাস উইম্যান ইন দ্য হিল ট্র্যাক্টস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১ টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক বৈষম্য এবং একইসাথে নারীর ক্ষমতায়নে আদিবাসী নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও নারী সম্প্রদায়ের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'ভেজা পালকের গান' প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক এনজিও এইসিআইডি এর অর্থায়নে সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (সিএসডি), তরঙ্গ ও আইডা'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন ইউল্যাব এমএসজে-এর একদল শিক্ষার্থী। প্রামাণ্য চিত্রটিতে ফুটে উঠেছে পাহাড়ি নারীদের অর্থনৈতিক জীবনধারা এবং সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেঁচে থাকার গল্প । আলোচনা পর্বে উপস্থিত আদিবাসী নারীরা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। তুলে ধরেন নানা সমস্যা ও আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যের কথা। সেখানকার অপ্রতুল শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে ঝরে পড়ে অনেক নারী শিশু, ভূমির উপর নারীর অধিকার সম্পর্কিত নানা জটিলতা, সামাজিক বিচারে নারীর ক্ষমতায়নের অভাব থেকে শুরু করে নারীর স্বাধীন চলাচলের উপর হস্তক্ষেপের মতো বিষয়গুলো উঠে আসে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে। এছাড়া নিজস্ব সংস্কৃতি মেনে চলতে নানা প্রতিবন্ধকতার কথাও আলোচিত হয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বকারী নারীদের বক্তব্যে।

অনুষ্ঠানে আদিবাসী নারীদের প্রস্তুতকৃত নানান হস্তশিল্প নিয়ে আয়োজন করা হয় এক প্রদর্শনীর। আদিবাসীদের তাঁতে বোনা শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রি-পিস, আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন তৈজস বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় প্রদর্শনীতে। এছাড়া অনুষ্ঠানে আদিবাসী নারীদের স্বাবলম্বীকরণ এবং ক্ষমতায়নে তরঙ্গ ও আইডা গৃহীত নানা কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত লুইস তেজাদা চেকন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব এমএসজে-এর প্রধান ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো, ইউল্যাব সিএসডিসহ ইউল্যাবের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীবৃন্দ ও তরঙ্গ-আইডা প্রজেক্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকবৃন্দ

ক্যামেরার পেছনে নারী

ইউল্যাবিয়ান প্রতিবেদক

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি'র হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর রূপ গণ্ডিবদ্ধ থাকে মাতৃত্বে আর সংসার সামলানোতে। কিন্তু, নারীকে চার দেওয়ালে বন্দী রেখে উন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছে। এমন ধারণাকে মাথায় রেখে নারীর ক্ষমতায়নে ইউল্যাব এমএসজে ও ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ ফিল্ম এন্ড মিডিয়া যৌথভাবে আয়োজন করে এক বিশেষ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার।

৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া 'ওমেন বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা: এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী এ কর্মশালাটি চলে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণকারী ২৭ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দান করেন খ্যাতনামা তুর্কী নারী পরিচালক যায়েদা আসলি। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্রনাট্য লেখার কৌশল, চিত্রগ্রহণ প্রক্রিয়া, ও ভিডিও সম্পাদনাসহ নানা বিষয়ে বিস্তৃত ধারণা দেয়া হয়। এ কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা 'আন্ডার ওয়াটার' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

তুর্কী পরিচালক যায়েদা ২০০৫ সাল থেকে নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতার বিষয়টি মাথায় রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আসছেন। কর্মশালাটি বিষয়ে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীলতার জগতটা কি শুধুই পুরুষদের জন্যে নিবেদিত? অবশ্যই না। পৃথিবীর যে কোন কাজের মতো করে সৃষ্টিশীল মাধ্যমের কাজে নারীরাও ততটুকুই পারদর্শী যতটুকু একজন পুরুষ। বাংলাদেশের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের নারীদের সৃষ্টিশীল এ মাধ্যমটিতে কাজে আগ্রহী করে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যেই আমার এ কর্মশালার আয়োজন।' তাছাড়া বাংলাদেশের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণেও বিশেষভাবে আগ্রহের কথাও বলেন যায়েদা।

সপ্তাহব্যাপী কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এম পি। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়নগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা) আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ ও চিত্রনায়িকা সারাহ বেগম কবরি এম পি। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুর্কী রাষ্ট্রদূত এম ভাকুর এরকুল সহ ইউল্যাবের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কর্মশালা চলাকালীন সায়েদার তত্ত্বাবধানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত উদ্যোগে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আন্ডার ওয়াটার'-এর বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার সমাপনী আয়োজনে অংশগ্রহণকারী ও কর্মশালার আয়োজকবৃন্দের সঙ্গে প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়িকা সারাহ কবরি এমপি

আপনি কি বাংলা সিনেমা দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যান?

সূত্রঃ ইন্টারনেট

জাহিদ গগন

শুকনো নদী কতটা রুক্ষ হয়? কিংবা এমন নদী যাতে বছরে একবার পানি এসে বছরের সব বর্জ্য ধুয়ে নেয়। নদীতে জোয়ার আসা মাত্রই গাঁয়ের সবাই সাঁতার দেয়। উৎসবের রোল পড়ে যায় ঐ গ্রামে। দেখেছেন এ দৃশ্যগুলো? চিন্তায় পড়ে গেলেন তো? কেন এসব কথা লিখছি? বিগত কয়েক বছর বাংলা সিনেমার ভুবন রুক্ষ নদীর মত শুকিয়ে ছিল। যাতে বছরে একবার পানির ছোঁয়া আমোদিত করে সবাইকে। কিন্তু, এটা বছরে একবার হোক, সেটা কাম্য নয় কখনো। কামনা - সিনেমার জোয়ারটা যেন সারাবছর থাকে। এবার হয়তো সেটা শুরু হল বলে।

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ এখন শুধুই অতীত। নব্বইয়ের দশকে বাংলা সিনেমার রুচিতে বেশ পরিবর্তন আসে। নব্বইয়ের পরপরই বেসরকারিকরণের হিড়িক পড়ে যায় অর্থনীতিতে। লুটপাট-সন্ত্রাস ও দুর্নীতি পায় নতুন মাত্রা। দুর্নীতির মাত্রা পৌঁছোয় এফডিসিতেও। কাটপিসসহ অশ্লীলতার নানান উপকরণের জোয়ারে ভেসে যায় বিএফডিসি। পরিচালকরা নতুন এবং অভিনব কিছু দিতে না পারলেও ভালো গল্পের জায়গা দখল করে নেয় অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ যৌন-উদ্দীপক দৃশ্য, নাচ, গান ইত্যাদি। সিনেমা হলগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে রুচিশীল দর্শক।

এখন গোটাকয়েক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এবং তরুণ নির্মাতাদের ছোঁয়ায় চলচ্চিত্র অঙ্গনে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। সুদিন হয়তো পুরোপুরি ফিরে আসেনি। কিন্তু, কিছু মানসম্মত সিনেমা তৈরি করে বাইরে থেকে বেশ কিছু পুরস্কার বাগিয়ে এনেছেন কয়েকজন নির্মাতা। মেধাকে বিকশিত করে স্বল্প বাজেটে নির্মাণ করছেন ভালো মানের কিছু ছবি। 'ব্যাচেলর', 'চন্দ্রকথা', 'মেড ইন বাংলাদেশ', 'স্বপ্নডানায়, 'রানওয়ে', 'আমার বন্ধু রাশেদ', 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার', 'মনপুরা' ও 'গেরিলা'সহ বেশ কিছু সিনেমা দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সুতরাং, মোরশেদুল ইসলাম, নূরুল আলম আতিক, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, গিয়াস উদ্দিন সেলিম, অনিমেষ আইচ, রেদওয়ান রনি, মোস্তফা কামাল রাজসহ নবাগত নতুন ধারার নির্মাতাদের উচিত এফডিসি'র হাল ধরা।

একটি বিশেষ মহল উঠেপড়ে লেগেছে এদেশে ভারতীয় সিনেমা আমদানি করতে। কিন্তু, ভারতীয় সিনেমা বাংলাদেশের সিনেমা শিল্পকে কতটুকু দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে? এদেশের সিনেমার জগতকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় সিনেমা প্রদর্শন কোনভাবেই কাম্য নয়। ভারতীয় সিনেমাগুলোর নির্মাণ কলাকৌশল এবং বাজেটের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কতটুকু আমাদের সিনেমার আছে? এক 'থ্রি ইডিয়টস' সারাবিশ্বে যত মুনাফা করেছে, বাংলাদেশের সব সিনেমা মিলে সারাবছরের মুনাফাও তার ধারেকাছে না। ভারতীয় সিনেমা আমদানিকে অনেকে স্বাগত জানিয়েছেন। বলছেন, এতে সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সিনেমার মান বাড়বে। কিন্তু, এটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। কারণ, দেশের প্রেক্ষাপটে কোটি টাকা বিনিয়োগকারী একজন প্রযোজকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাড়া চিন্তা করার ক্ষমতাতেও রয়েছে ঘাটতি।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৩ সালে ঢাকার চলচ্চিত্র বদলে দেওয়ার জন্য অন্যতম ভূমিকা রাখবে ৭টি ছবি। চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'টেলিভিশন', রেদওয়ান রনির 'চোরাবালি', সোহেল আরমানের 'এই তো প্রেম', মুহম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের 'ছায়াছবি', সরদার সানিয়াত হোসেনের 'অল্প অল্প প্রেমের গল্প', ইফতেখার আহমেদ ফাহমির 'টু বি কন্টিনিউড' এবং নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামূলের 'এক কাপ চা'। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ ৭টি চলচ্চিত্রই দিন বদলের জন্য ২০১৩ সালের সুপার ট্রাম্প কার্ড। চলচ্চিত্রগুলো শুধু বাণিজ্যিক দিক থেকেই নয়, দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের রুচি পরিবর্তনেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে মুক্তি পাওয়া 'চোরাবালি' এবং 'টেলিভিশন' সে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

নিজেরা বাঙালি হয়ে আমরা বাংলা সিনেমার জন্যে কতটা করি? এমনকি একটা সিনেমা দেখতে হলেও পা রাখি না! মুখেই শুধু বড় বড় বুলি, বাংলা সিনেমা ভালো না, মানসম্মত না। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি মানসম্মত দর্শক? আপনি কি সিনেমা দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যান? নাকি প্রেক্ষাগৃহে না গিয়ে ঘরে বসেই এসব বুলি। তাই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে কিভাবে

(বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ৪, কলাম ৩)

ভৈরব

সানজিদা হক

ভৈরব। কাজী শাহেদ আহমেদ - এর প্রথম উপন্যাস 'ভৈরব' অসাধারণ ভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছে প্রধান চরিত্র মুন্সি হায়দার আলি ভৈরবের অনবদ্য চরিত্রকে অবলম্বন করে। এ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেশপ্রেমের তীব্রতা, সমাজ সংস্কারে এক সচেতনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থানকে। ফুটে উঠেছে এক মানবের প্রেম-ভালোবাসার অবিনশ্বর এক সম্পর্ক। ভৈরব এমন এক চরিত্র যে ইংরেজদের গোলামির বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাকে সে ত্যাগ করে। এমনকি সে মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সতর্ক করে অপ্রকৃত এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে।

'আমি আন্ডার মেট্রিকুলেশন... আর আমার কোন ইচ্ছা নাই ইংরেজিতে পড়াশুনা করে কারো গোলাম বনার'-কণ্ঠের বলিষ্ঠতায় যেমন ভৈরবের দেশপ্রেম বর্ণিত হয়েছে। তেমনি পরবর্তীতে লেখক তাঁর কৌতুকপূর্ণ ও বক্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বর্ণনা করেছেন হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ, ধর্মের আড়ালে ভণ্ডামী এবং নারীদের প্রতি অবমাননার গল্প। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সকল বাধা অতিক্রম করে ভৈরব আপন করে নেয় প্রণয়িনী শিউলিকে। অপরদিকে খোকন ও দুলালের সম্পর্ক টিকে থাকে তাদের বার্ধক্য পর্যন্ত। সমাজের গোঁড়ামি হার মানে ভালোবাসার উত্তাপের কাছে। উপন্যাসটির ভাষা, কাহিনী, চিত্রপট, চরিত্রবিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার।

অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে আমাদের সুশীল সমাজের বিষাদময় কালো অধ্যায়গুলো। উপন্যাসের চরিত্র বিন্যাসের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়েছে সমাজের নানা সমস্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। লেখক বইটির ইতি টেনেছেন খুবই কৌশলীভাবে। সময়ের পরিবর্তনে দীর্ঘ ৭৩ বছরের চিত্রপট তিনি এঁকেছেন দুর্দান্তভাবে। বইটি শেষ হয়েছে পাঠক হৃদয়ের কিছু সংলাপ দিয়ে, যেখানে ভৈরব চরিত্রের অবস্থান ছিল সর্বত্র। ভৈরব ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন একজন মানুষ, যার অবস্থান ছিল সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে। এ রূপটি বোধগম্য হয় ভৈরব চলে যাওয়ার পর। উপন্যাসটির শেষ সংলাপ – 'দাদা তোমাকে আমরা কেউ চিনলাম না। শুধু খাতুন চিনেছিল। তুমি সত্যি বাজান' যে বিষয়টির সাক্ষ্য রাখে।

(বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ৫, কলাম ৩)

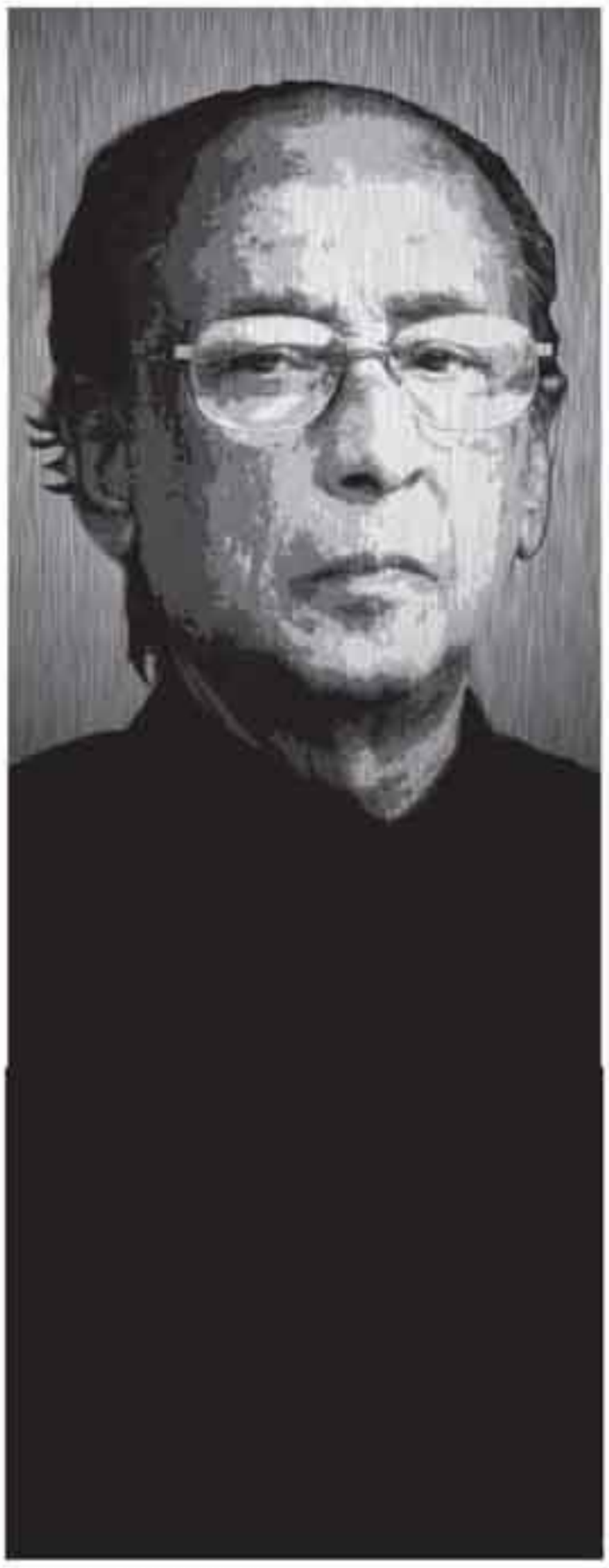

ধয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান

দুর্দমনীয় বাঙালী জাতিসত্তার বিনিদ্র কান্ডারী

মোঃ জিল্লুর রহমান

ফয়সাল আহমেদ

'ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।'
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত এ পঙক্তির এক শাশ্বত চরিত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯তম মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রয়াত মোঃ জিল্লুর রহমান। বাঙালি জাতি তথা সমগ্র বাঙালি সত্তার এক জীবন্ত রাজনৈতিক কিংবদন্তি মোঃ জিল্লুর রহমান । ১৯২৯ সালের ৯ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানাধীন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। চারিত্রিক আদর্শবোধ, মানবিক গুণাবলী, নমনীয়তা এবং একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁর জীবনে সফলতার মূল পুঞ্জীভূত শক্তি।

জিল্লুর রহমান তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে। ১৯৪৫ সালে কে.বি. হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মানবিক বিভাগ থেকে আই.এ. এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও এল,এল,বি ডিগ্রী অর্জন করেন তিনি। ১৯৪৬ সালে কলেজে ছাত্র থাকাকালে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ করেন তিনি। ছাত্র রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন মহান এই নেতা। ১৯৪৬ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্র থাকা কালে সিলেটে গণভোটে কাজ করার সুবাদে তিনি সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য লাভ করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মোঃ জিল্লুর রহমান প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্র সমাবেশে মোঃ জিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং এখানেই ২১ ফেব্রুয়ারির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুর পাড়ে যে ১১ জন ছাত্র নেতার নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয় তাদের মধ্যে মোঃ জিল্লুর রহমান ছিলেন অন্যতম। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সহ প্রতিটি গণআন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থেকে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। মোঃ জিল্লুর রহমান ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' ও 'জয় বাংলা' পত্রিকায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। এ সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার সংসদ সদস্যপদ বাতিল করে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে জিল্লুর রহমানকে ২০ বছর কারাদণ্ড প্রদান করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণয়নে অংশ নেন।

১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ এবং ১৯৯৭ সালে দলীয় কাউন্সিলে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান পর পর দু'বার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরী আইন জারির পর ঐ বছরের ১৬ জুলাই রাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে তাঁর অবর্তমানে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দল পরিচালনা করেন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ের পর তিনি ৬ষ্ঠ বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।। ২০০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মোঃ জিল্লুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। নবম জাতীয় সংসদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে সার্থকতার সাথে দায়িত্ব পালনকালে গত ২০ মার্চ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালেচিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

জয় বাংলার ফিরে আসা

সানজিদা হক

তরুণ কণ্ঠে জয় বাংলা! স্বাধীনতার ৪২ বছর পর এ যেন পুনরায় ঘোরমুক্ত হওয়া। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত আসামী কাদের মোল্লার রায়ের ঘোষণা সাধারণ জনগণের মনে জন্ম দেয় এক চরম হতাশার। ক্ষোভ প্রকাশে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তরুণ প্রজন্ম শুরু করে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ। ঝাঁঝালো তারুণ্যের কণ্ঠে ছিল আবেগ ভরা স্লোগান, দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির। তরুণ প্রজন্ম '৭১ দেখেনি। কিন্তু, তাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে বাংলার শহীদ বীরদের রক্ত। 'জয় বাংলা'সহ মুক্তিযুদ্ধের নানা স্লোগান যেন ফিরে এসেছে নতুন প্রেরণায়, নতুন উদ্যমে। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাংলার সন্তানেরা – দেশ মাতার সাথে তারা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কোন অপশক্তি এ অনুভূতিকে নষ্ট করতে পারবে না। তাই নব্বইয়ের দশকে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মত করে যুদ্ধাপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিতে গণমঞ্চ তৈরিতেও পিছপা হয়নি তরুণ সমাজ।

অধ্যাপক জাফর ইকবালসহ এদেশের অনেক বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠদের ধারণা , বাংলার ছেলে-মেয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ যে মাঠে নেমে করতে হয় তা ভুলে গেছে। তারা শুধু ব্লগ লিখে সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলোতে 'লাইক' সঞ্চয়ের মাঝেই নিজের দায়িত্বকে সীমিত করে দিয়েছে। সেসব বয়োজ্যেষ্ঠদের বদ্ধমূল এ ধারনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় নতুন প্রজন্ম। হাজারো তরুণ-তরুণী বের হয়ে আসে ঘর থেকে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোল ঘেঁষা শাহবাগ মোড়ে। জন্ম হয় নতুন এক অধ্যায়ের। যার পরিচয় হয় গণজাগরণ চত্বর হিসেবে। একাত্তরে আবেগ প্রেরণার, ঐক্যের উৎস ছিল যে 'জয় বাংলা' স্লোগান, বিয়াল্লিশ বছর পর এসেও সে একই স্লোগান বাঙালিকে প্রেরণা যোগায়, যোগসূত্র তৈরি করে দেয় একাত্তরের চেতনার সাথে।

অনেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্লোগান বলে মনে করেন। কিন্তু, ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, ১৯৬৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে শিক্ষা দিবস পালনের জন্যে কর্মসূচী প্রণয়নের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহুত সভায় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আফতাব আহমেদ ও চিশতী হেলালুর রহমান প্রথমবার 'জয় বাংলা' স্লোগানটি ব্যবহার করেন। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় এ স্লোগান ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণেও তিনি সমাপ্তি টানেন 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এ স্লোগান বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ মেজর জিয়া কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন তার শেষেও তিনি বলেছিলেন 'জয় বাংলা'।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক গণদাবীতে যখন তরুণ প্রজন্ম এ স্লোগান উচ্চারণ করছে, তখন তাদের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। উঠছে গণমঞ্চ নিয়ে নানা প্রশ্ন। যারা জয় বাংলা কণ্ঠে নেয়ায় তরুণ প্রজন্মের গণসমাবেশকে সন্দেহের চোখে দেখেন তারা সম্ভবত ভুলে যান, 'জয় বাংলা' কোন দলের স্লোগান নয়, এটি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

চরিতার্থ করার হাতিয়ারও নয়। এ স্লোগান সাক্ষ্য রাখে একাত্তরের চেতনার। বিয়াল্লিশ বছর পর তাই 'জয় বাংলা'র ফিরে আসা আবারও প্রমাণ করল, এ স্লোগান কখনও বাঙ্গালির মন থেকে মুছে যাবার নয়। সময়ের স্রোতে তাকে দাবিয়ে দিলেও ফিরে আসবে বার বার, যুগে যুগে বাঙালির অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হয়ে।